জ্যোতির্ময় নিত্যানন্দ

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

সূচিপত্র

কথামুখ

জ্যোতির্ময় নিত্যানন্দ ১৫

বৈষ্ণবের ধারাপ্রবাহে নিত্যানন্দ ৮০

বিরল ব্যক্তিত্ব নিত্যানন্দ ৮৮

নিত্যানন্দ অনুমোদনে বৈষ্ণব নেতৃত্ব ৯৪

নিত্যানন্দ বংশানুক্রম ১২৬

বৈষ্ণবের সংজ্ঞা ১৪০

শ্রী চৈতন্য জীবনপঞ্জি ১৪১

নিত্যানন্দ বংশপঞ্জি ১৪২

নিত্যানন্দ জীবনপঞ্জি ১৪৩

বৈষ্ণব নেতৃত্ব বিন্যাস ১৪৪

বৈষ্ণবের পাট-পর্যটন ১৪৭

ছবি, গ্রন্থপঞ্জি এবং নির্দেশিকা ১৫৩

বৈষ্ণবধারা

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম
(পালযুগ)

↓

- হিন্দু তন্ত্র
- সহজ যান
  ↓
  - সহজিয়া মুসলমান (সুফি)
  - সহজিয়া হিন্দু (বৈষ্ণব)
    ↓
    প্রাক্-চৈতন্য যুগ
    (জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ...)
    ↓
    - চৈতন্য
      (খানিকটা হলেও নিয়মনীতি নিষ্ঠা-ভক্তি-আচার-বিচারকে মান্যতা। ব্রাহ্মণকে গুরুত্ব। বাধ্যতামূলক বৈষ্ণবসেবা, অঙ্গরাগ তিলক-সেবা, পুজো-পার্বণ,...)
    - নিত্যানন্দ
      (মানবধর্মে বিশ্বাস। নিয়মনীতির ক্ষেত্রে উদারতা, সহজপন্থা। সেবা-পুজোর ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যতামূলক কঠোরতা নেই। উদারপন্থী, মুক্ত পথের দিশা,...)

↓

উত্তর-চৈতন্য যুগ

- জাহ্নবা
  (নারী প্রগতি)
- বীরচন্দ্র
  (পরিমার্জিত বৈষ্ণবধর্ম 'উদার বাউল ধর্ম' জাহ্নবার আনুকূল্য।)
- রামচন্দ্র
  (জাহ্নবার পালিত পুত্র)
  বাঘনাপাড়ার ধারা

↓

বৈষ্ণবধর্ম

নিয়মের কড়াকড়িহীন। মানবধর্ম ও মানবত্বে আস্থা। জনসম্মিলন ও জীব সেবা। আত্মবিশ্লেষণ, আত্ম-উপলব্ধি। মানুষে বিশ্বাস, প্রেমে আস্থা। জাতিবর্ণহীন প্রেম।

কথামুখ

প্রবাদ আছে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তর তীর হতে মাড়গ্রাম থানার তেঁতুলিয়া-বিষ্ণুপুর এলাকা পর্যন্ত উত্তরে এবং গণপুরের ক্যানেল পেরিয়ে শিবপাহাড়ির টিলা-জঙ্গল পর্যন্ত পশ্চিমে আর ঘোষগ্রাম বা বীরভূমের শেষ সীমারেখা পূর্বে নিয়ে এক বিস্তীর্ণ এলাকা প্রাচীন 'একচক্রা'র এলাকা। মহাভারতীয় 'একচক্রা'। অজ্ঞাতবাসের কালে নাকি পাণ্ডবেরা এই এলাকায় অবস্থান করেছিলেন। সেই মর্মে এলাকায় বকরাক্ষসের 'কোট্' বা রাজধানী 'কোটাসুর', অসুরদের বসবাসের জায়গা 'অর্সুলা'বা 'অসুরালয়', 'পাণ্ডবতলা', বেলগ্রাম-কলেশ্বরের বিল্বাসুর- কলাসুর-কলাবতী এসবই ভাবনার মধ্যে এসেছে। এলাকাটির প্রাচীনত্ব অবশ্য নানাদিক দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে বারবার। এলাকায় প্রাচীন বাউলদের নানান আশ্রমের শেষ-অবশেষ এখনও নজরে পড়ে। কোটাসুরের মদনতলা এলাকা থেকে প্রাচীন প্রত্ন-সামগ্রীও উত্তোলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলেও জন চীপের গুণুটিয়ার রেশমকুঠি উল্লেখযোগ্য। আসলে বীরভূমের জঙ্গলমহলে বৌদ্ধ-জৈন-তান্ত্রিক-বৈষ্ণব-ইসলামিক প্রভৃতি নানান ধর্মের সমন্বয় সাধিত হয়েছে বহুকাল আগে থাকতেই। সে অর্থে জেলা বীরভূম একটি গবেষণাগার। এখানের মাটিকেই বেছে নিয়েছেন ঋষি-বিপ্লবী-সমাজ সংস্কারক-গবেষকরা। কমবেশি সার্থকতাও লাভ করেছেন প্রায় প্রত্যেকেই।

কিন্তু এমন একটি মূল্যবান এলাকারও যথার্থ ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। আঞ্চলিক ইতিহাস কখনোই নির্ভুল ও সমাপ্ত হয় না। যদিও একালে অর্থাৎ একবিংশ শতকের ঊষালগ্নে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও রচনা-আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে, তথাপি বীরভূম-গবেষকদের কাছে ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলিত তিন খণ্ডের 'বীরভূম বিবরণ' এবং গৌরীহর মিত্রের 'বীরভূমের ইতিহাস' ভিন্ন মান্য গ্রন্থ তেমন আর কিছু নেই। একালেও ক্ষেত্র সমীক্ষার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। বরং উপরোক্ত বই দুটির সঙ্গে নীহাররঞ্জন-রাখালদাস-অতুল সুর-দীনেশ সেন-গোপাল হালদার-হান্টার-অমলেন্দু দে- ও ম্যালি এমনকি বিনয় ঘোষ পর্যন্ত মিলিয়ে একটি কল্পিত আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা চলেছে। আর সে কারণেই বৃহৎ-ধ্রুপদি ইতিহাসে অবহেলিত হচ্ছে আঞ্চলিক ইতিহাস। মানুষের সৃজিত ইতিহাসে মানুষকে তো কোনোভাবেই বাদ দেওয়া চলে না।

প্রাচীন একচক্রার এলাকা এখন ফসলে ফাগুন। প্রচুর আলু-গম-ধান হচ্ছে এলাকায়। সরকার থেকে মাঠে মাঠে জলের উৎসমুখ খুলে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা-ঘাট-যানবাহনের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। প্রাচীন খলক > খলপ > 'খলৎপুর' 'একচক্রা গর্ভবাস' 'তথা বর্তমানের বীরচন্দ্রপুরের সামান্য দক্ষিণেই সেই বাদশাহি-সড়ক। যে পথটি ধরে মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি ঘোড়া ছুটিয়ে কান্দি-আন্দি-কুণ্ডল- সনকপুর-হাজিপুর-দক্ষিণগ্রাম-নন্দীগ্রাম- মালঞ্চ-মল্লারপুর-কাষ্ঠগড়া-শালবাদরা বা ডামরা হয়ে বিহার যেতেন, সেই পথটিও এখন পাকা। বাস চলছে। দু-পাশে সবুজ ফসলের খেত। নন্দীগ্রাম অঞ্চলে একসময় নাথ-পন্থী সাধকেরা থাকতেন, তাঁরা খুবই পরিশ্রমী ছিলেন। পুকুরের পাড়ে নন্দীগ্রামে তাঁদের তাঁতশিল্পীরা ছিলেন একসময়। সে সময়ের একচক্রায় বারো বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন বিশিষ্ট বৈষ্ণব- সংগঠক-প্রচারক নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিতাই। যিনি মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সংগ্রহের পরই জীবপ্রেমের মাধ্যমে —শ্রম ও কর্মের মাধ্যমে মানবপ্রেমিক চৈতন্যের সন্নিধানে পৌছোনোর পথ চিহ্নিত করেছিলেন। সারা মধ্যযুগ জুড়ে নিত্যানন্দ সাম্যবাদের প্রচার করেই অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে স্বমহিমায় বেঁচে আছেন।

একচক্রা এলাকাটিতেও বীরভূমের অন্যান্য জায়গার মতোই বৌদ্ধ-জৈন-তন্ত্র-বৈষ্ণব সবই একাকার হয়ে আছে। আবার এই এলাকাটিই একদা রুক্ষ-পতিত ডাঙায় পরিপূর্ণ ছিল। ছিল জঙ্গলে ভরা অরণ্য-অঞ্চল। সেসব জঙ্গলভূমি সাফ করেই, রুক্ষ মাটির সঙ্গে লড়াই করেই এলাকার মানুষ এ এলাকাকে সুজলা সুফলা করে তুলেছে। সুতরাং 'কর্মবিহীন ধর্ম' এ এলাকায় হয়েছে বলে মনে হয় না, সে প্রাচীন বা মহাভারতীয় কাল হলেও। এ কারণেই বোধহয় শ্রমজীবী-ক্ষমতাবান গণমানুষের বাস চিরদিনই একচক্রা এলাকায় বেশি। যারা কিনা 'রাক্ষস' 'অসুর' ইত্যাদি নামে কল্পিত হয়ে এসেছে বহুকাল। হেতমপুরের রাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত ও ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'বীরভূম বিবরণ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে— 'একচক্রা-কাহিনী' অংশে সেই সূত্রেই সম্ভবত প্রাচীনগণের 'রাক্ষস' এবং 'অসুর'-দের গুলিয়ে ফেলার কথা উল্লেখ হয়েছে। অতুল সুর 'অসুর' 'রাক্ষসদের' আর্যদেরই একটি অংশ এবং পরিশ্রমী মানুষজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিকদের অনুমান সাপেক্ষে বলা যায় অতীতের রুক্ষ একচক্রা এবং সন্নিহিত এলাকার গভীর অরণ্যভূম জুড়ে 'বেত্রকীয় গৃহ' নামের এক জায়গায় 'বুদ্ধিহীন-অজ্ঞ' এক রাজা বাস করতেন। মহাভারতেও সেই বোকা রাজার নাম উল্লিখিত হয়নি। আবার এও বোঝা যায় 'বক রাক্ষস'-ই সেই দূর অতীতে একচক্রা এবং বেত্রকীয়-গৃহের অধীশ্বর ছিলেন। 'বেত্রকীয়-গৃহ' নামে একচক্রা এলাকায় কোনো গ্রামের সন্ধান আমি পাইনি। তবে প্রবাদ এবং জনশ্রুতি মিশিয়ে কানে এসেছে— 'কোটাসুরই সেই প্রাচীন বেত্রকীয়-গৃহ'। আর লোহাপুর-বারা এলাকায় 'রাক্ষসের ডাঙা' নামে যে জায়গা, সেখানেও বক-রাক্ষস সাময়িকভাবে বসবাস করতেন। তবে ভীম এবং বক রাক্ষসের

যে লড়াই হয়েছিল, তারই ফলে সৃষ্টি হয় নাকি 'ঝিকড্ডার বিল'। ভীম বধ করে বক রাক্ষসকে। বককে বধ করেই এলাকার মানুষের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনেন তিনি, একচক্রা এলাকার মানুষের মন থেকে আতঙ্কেরও অবসান হয়। আসলে ভীম এবং বকের সামাজিক অবস্থানটি পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি থেকে একটি সুন্দর সুচারু পথ বেরিয়ে আসে।

ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন (বীরভূম বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড) অতীতে দুর্মদ সেন নামে কোনো এক সামন্ত রাজা কোটাসুরে রাজত্ব করতেন। কোটাসুরের নাম তখন ছিল 'দুর্জয় কোট'। এই দুর্মদ সেন 'মদনেশ্বর' শিবের আরাধনা করে এক পুত্র লাভ করেন এবং তার নাম রাখেন 'মদনদাস'। দুর্মদের পর মদনের রাজত্বকালে জনপ্রবাদ দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লবেরই অধিনায়ক ছিলেন বলশালী 'বক রাক্ষস'।

ড. অতুল সুর তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে বলেছেন— 'দ্রাবিড়ই বলুন আর আর্যভাষা-ভাষী 'অসুর' জাতিই বলুন, এরা ভারতের আদিবাসী প্রাক্-দ্রাবিড়দের সঙ্গে কীভাবে মিশে গিয়েছিল তা আমরা জানি না। সম্ভবত এই মিশ্রণ হয়েছে বাণিজ্য সম্পর্কিত বন্ধুত্বের সুযোগ ও বিবাহের মাধ্যমে।' আগন্তুক 'নর্ডিক' বা বৈদিক আর্যরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসেনি, এসেছিল ধর্মধ্বজী যোদ্ধা হিসেবে। আর্য-সংস্কৃতির গরিমা এবং এদেশের আদিবাসিন্দাদের প্রতি ঘৃণাও তাদের কম ছিল না। তাই ভীম এই একচক্রা নগরে এসেই হিড়িম্বা-র প্রেমে পড়েছেন এবং তাকে বিয়েও করেছেন। আর্য সমন্বয়ের উদাহরণ হিসেবে এই প্রবাদকথাটিই যথেষ্ট। আর্যরাই নিজেদের সীমানার বাইরের মানুষজনকে 'রাক্ষস-অসুর-দস্যু' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সেইসূত্রে একচক্রানগরকেন্দ্রিক এলাকাটি 'অসুরদের' দেশ হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। যদিও ভীম এবং হিড়িম্বা-কে কেন্দ্র করে একচক্রার 'অসুর-সংস্কৃতি'র সঙ্গে মেলবন্ধনের পরিকল্পিত চেষ্টাও একটি হয়েছে। তথাপি অসুরদের দেশকে 'ব্রাত্য' দেশ বা বেদ-বহির্ভূত দেশ বলেও ভাবা হয়েছে। এখানে পাণ্ডবেরা এসেছিলেন কিনা সেটি বড়ো কথা নয়।

এই অসুরদের ব্রাত্যদেশ (!) কে বৈষ্ণব-সংগঠক নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র বীরচন্দ্রই প্রথম আলোর পাদপীঠে স্থাপন করেছেন। নন্দীগ্রাম-দক্ষিণগ্রাম অঞ্চলে এক সময় নাথ-পন্থী সাধু-যোগীরা আসন পেতেছিলেন। জৈন-বৌদ্ধ-শৈব-শাক্ত প্রভাবেও তারাপীঠ-ময়ূরেশ্বর-কলেশ্বর এলাকাটি বহুকাল আচ্ছন্ন। তথাপি নিত্যানন্দ একচক্রা নগরের ভিন্ন একটি মর্যাদার স্থান তৈরি করেছেন অপাংক্তেয় জনসমাজকে মর্যাদা দিয়েই। তাঁর আগে এ এলাকায় এমনভাবে পঙ্ক্তিহারা মানবপ্রেমের বন্যা বয়ে যায়নি। তিনিই বুঝেছিলেন মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান স্থির না হলে 'চৈতন্য' আসে না, আবার চাঞ্চল্য থাকলে আরাধনাও সম্ভব নয়। এমন সাম্যবাদী জননেতা একচক্রা নগরীর ইতিহাসটিকেই বদলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ

জন্মগ্রহণ করেন একচক্রায়, সেখানে মাত্র বারো বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন তিনি। তারপর কুড়ি বছরের পর্যটকের জীবন। ভারতবর্ষের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন তখন। দেখেছেন সরল-সাধারণ-শ্রমিক মানুষ। তারপর নবদ্বীপে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি প্রায় ঊনসত্তর বছর বেঁচেছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন বৈষ্ণবের উদার মানবধর্ম। সেখানেও 'দ্বাদশ-গোপাল' অর্থাৎ বারো জন নেতা নির্বাচন করেছিলেন তিনি, যাঁরা গৌড়ীয়-দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আঠান্নটির মতো শ্রীপাট-আশ্রম-বৈষ্ণবক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তথাপি এই একচক্রা এলাকায় নিত্যানন্দের স্পর্শধন্য একমাত্র ময়ূরেশ্বরের কুণ্ডলতলাটি ভিন্ন আর কোনো বৈষ্ণব ক্ষেত্রের সন্ধান নেই। জলন্দিতে কিছুকাল ধনঞ্জয় গোস্বামী থাকলেও, দ্বাদশ গোপালের একটিও 'পাট' প্রতিষ্ঠিত হয়নি বীরভূমে। তুলনায় বীরচন্দ্র প্রভাবিত 'বাউল আখড়া' রয়েছে কলিতরা-কোটাসুর- দাদপুর-ঘাটপলসা-চন্দ্রহাট প্রভৃতি নানান স্থানেই। ময়ূরেশ্বর নিত্যানন্দের মামারবাড়ি, সেখানেও বলরামের পুজো-পাঠ হয়। একদা এই ময়ূরেশ্বর চিহ্নিত ছিল 'কোট্-ময়ূরেশ্বর' হিসেবে। ছিল দুর্গ, পরিখা এবং মুকুট রায়ের রাজধানী। তাঁরই নিবেদিত বিশাল দিঘি। তবে 'মুকুটেশ্বর শিব' নামে এখানে কোনো শিব এখন আর নেই। দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শিব ছিল, আছে কালাপাহাড় খণ্ডিত 'পলাশ বাসিনী' নামের গ্রামদেবী। মহুরাপুরের শিবকে অনেকসময় 'মৌড়েশ্বর শিব' বলেও অবিহিত করা হয় এবং এই শিবের পুজো নাকি নিত্যানন্দের বাবা হাড়াই পণ্ডিত করেছেন। নিত্যানন্দের মা পদ্মাবতী ছিলেন ময়ূরেশ্বরের মুকুট রায়ের কন্যা। কুলাচার্যের মতে এ ঘটনা পাঁচশো বছরেরও আগের ঘটনা। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তেরও জন্মভূমি ময়ূরেশ্বর। তবে সে দত্ত বংশের কোনো অস্তিত্বই আজকের ময়ূরেশ্বরে নেই। নারায়ণ দত্তের সন্তান ছিলেন চক্রপাণি দত্ত, তাঁর লেখা 'চক্রদত্ত' ও 'দ্রব্যগুণ' আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুমান করেছেন এই চক্রপাণি দত্ত 'সার্ধ-অষ্টশত' বছর আগে ময়ূরেশ্বরে বর্তমান ছিলেন। আবার ডাবুকের 'উন্মত্তেশ্বর' বা 'ডাবুকেশ্বর শিব'-এর অর্চনা নাকি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও করেছিলেন। কৈলাশানন্দ গিরি মহারাজ তাঁর ভিক্ষালব্ধ অর্থে এই শিবের সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করান। পরবর্তীকালে কৈলাশানন্দের মন্দির ও আশ্রম স্থাপিত হয়েছে দক্ষিণগ্রামের পূর্বমাঠে, তাঁর অন্যতম শিষ্য গোঁসাই বাবার প্রত্যক্ষ প্রবর্তনায়।

আসলে একচক্রা নগর এলাকাটি প্রাথমিকভাবে 'অসুর' তথা শ্রমজীবী-কর্মঠ-বলবান মানুষের আধিপত্যেই ধরা ছিল। পরবর্তীকালে সেই তথাকথিত 'অ-চতুর' মানুষজনকে সরিয়ে-বিতাড়িত করেই অন্যেরা, আর্যরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। মাঝখানে নানান গল্পগাথা রচনাও করে নিয়েছেন তাঁরাই। তথাপি একচক্রানগর এলাকায় আদি-অস্ট্রাল বা প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার বহু নিদর্শন প্রবাদকথা আজও সমসূত্রে গ্রথিত।

প্রথম গণতান্ত্রিক-উদার-সম্প্রীতির বাণীবাহক নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমের

একচক্রায় জন্মেছিলেন। সে আজ পাঁচশো বছরেরও আগের কথা। বৌদ্ধ-জৈন-তন্ত্র-নাথ-শৈব প্রভৃতি ধর্মের বেড়ায়-ঘেরা সেকালের ভারতবর্ষ, বাংলাদেশও। ইসলামও প্রকট সে সময়। এমনই একটি বিপন্নতার কালে বৈষ্ণবধর্মের উদারতা, প্রেম নিয়ে হাজির হয়েছেন চৈতন্য। সেই মানবধর্ম 'মানবপ্রেমে'র মন্ত্রেই উৎসর্গীকৃত। নদিয়ার নবদ্বীপে জন্মে জীবনের শেষ বছর-গুলি পুরীতে কাটিয়ে পণ্ডিত চৈতন্য, নতুন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবিষ্কারক বিশ্বম্ভর পুরীতেই লীন হয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যু নিয়েও নানা কথা।

গণনায়ক-গণগায়ক-গণসম্মিলনসাধক নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর সহযোগী, তাঁর মত ও পথ-প্রচারের প্রধান কান্ডারি। তথাপি তিনি নিত্যানন্দ স্বরূপ, নিত্যানন্দ অবধূত। সবক্ষেত্রেই তাঁর 'জ্যোতি', তাঁর 'নিজস্বতা'য় প্রকাশিত। তাঁকে নিয়ে সর্বাংশে গ্রাহ্য করার মতো জীবনকথা বা বই এখনও নেই। তথাপি অনেক আঁধারের মধ্যেও তিনি উজ্জ্বল, আলোকিত। ব্যতিক্রমী এক বৈষ্ণব সেনানি। পরিকল্পিত অন্ধকার দিয়ে তাঁকে আড়াল করার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। তিনিই গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের মানবপ্রেম, উদারতা, জীবসেবা, পথ-সংকীর্তনের মাধ্যমে গৌরলীলা প্রকাশ করে গেছেন। এমন জনগণের মনের অধিনায়ক জাতিপঙ্ক্তি হারা মানব প্রেমিক জ্যোতির্ময় পুরুষ, বিপন্ন মানুষের—বিচলিত মানুষের পথ-প্রদর্শক। এমন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব এ ভারতে তাঁর আগে কেউ নেই, পরেও কেউ এখনও জন্মগ্রহণ করেননি।

এমন জ্যোতির্ময় আলোকিত নিত্যানন্দের 'জ্যোতি'কে আমি স্পর্শ করেছি নিত্যানন্দ-জন্মস্থান বীরচন্দ্রপুরের আশ্রমাধ্যক্ষ শ্রী শ্রীজীবশরণ দাসের আনুকূল্যে। তাঁকেই তাই এ গ্রন্থ উৎসর্গ করে আমি কৃতার্থ। ভাই-বন্ধু কাঞ্চন সরকারের কাছেও অপরিশোধ্য ঋণ। তার সম্পাদিত 'নয়াপ্রজন্ম' পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে সপ্তাহে সপ্তাহে বেরিয়েছে এই গদ্য। তাছাড়াও নিত্যানন্দের পঞ্চদশতম উত্তরপুরুষ খড়দহের 'নাচুনে গোঁসাই' সরোজেন্দ্রমোহন গোস্বামী আমাকে ঘুরে ঘুরে খড়দহের 'গোস্বামীপড়া'র বহু ঐতিহ্য, নিত্যানন্দ স্মৃতিধন্য স্থান দেখিয়েছেন। রহড়া-সাহাপাড়ার বরুণ সাহা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন পানিহাটি, আতিথ্য দিয়েছেন। আমার নিত্যানন্দকেন্দ্রিক ভ্রমণে কালনা-কাটোয়া-পুরী-নবদ্বীপ-জলন্দি-বীরচন্দ্রপুর-পানিহাটি-ময়নাডাল-মায়াপুর-নৈহাটি-উদ্ধারণপুর প্রভৃতি বহু জায়গায় বহুজনের সঙ্গ সান্নিধ্যে আমি ধন্য হয়েছি। পুরী গিয়ে গম্ভীরার বর্তমান মহারাজ ধ্যানচন্দ্রের এবং হরিদাস সমাধিক্ষেত্রের আশ্রমাধ্যক্ষ অখণ্ড হরিনামের মহাসেবকের কাছেও শুনে এসেছি নানান কথা। শুনেছি সবার কথা। লিখেছি নিজের মতো।

এ পরিশ্রম যদি কারোর ক্ষেত্রে এতটুকু নিত্যানন্দ-আনন্দ সংযোজিত করতে পারে, তাতেই আমি ধন্য। জয় নিতাই—

জানুয়ারি ২০১৫ আদিত্য মুখোপাধ্যায

জ্যোতির্ময় নিত্যানন্দ

শুন রাঘব! আমি তোমায় নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই।।
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন মোরে।
সেই আমি করি ইহা কহিনু তোমারে।।
আমার সকল কর্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে
এই আমি অকপটে কহিল তোমারে।।

....

তিলার্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যার রহে।
সতত ভজিলেও সে মোর প্রিয় নহে।।

....

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য জানিহ তাহারে।।
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
নিতাই পারে হেন কৃষ্ণে করিতে বিক্রয়।।
প্রভু কহে এই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা সে করে আমারে।।

'চৈতন্যভাগবত' নিত্যানন্দ দীক্ষিত বৃন্দাবন দাসের লেখা, সেখানে নিত্যানন্দ-স্তুতি থাকারই কথা। কিন্তু এই গ্রন্থটি ভিন্ন আর তো কোনো গ্রহণযোগ্য বা ঐতিহাসিক বই-ও নেই যেখান থেকে নিত্যানন্দের সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব। সমকালীন পদকর্তারা, গৌরাঙ্গের জীবনীকারেরা নিত্যানন্দের জন্য সিকিভাগও ভাবেননি— সিকিভাগ সম্মানও তাঁকে প্রদর্শন করেননি। তাঁদের যা-কিছু ভাবনা এবং লেখাপত্র সবই গৌরাঙ্গকে ঘিরে। অথচ গৌরাঙ্গ নিজেই পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতকে এমনসব দিক্‌দর্শী কথাবার্তা বললেন! যে পানিহাটির 'দণ্ডমহোৎসবে' সর্বজাতির সমন্বয় সাধন করেছিলেন নিত্যানন্দ। ছত্রিশ-জাতের মানুষকে একসঙ্গে পাতপেড়ে চিঁড়ে-ফলার খাইয়ে ছেড়েছিলেন জাত্যাভিমান দূরে ছুঁড়ে ফেলে। সেই চিঁড়েও সংগৃহীত হয়েছিল সোনার বেনের ঘর হতে। তাহলে কেন এমন হল? যিনি জগজনচিত্ত জয় করলেন তাঁর জন্যও রইল না দুপৃষ্ঠার সম্পূর্ণ জীবনী বা বাস্তবোচিত ঐতিহাসিক তথ্যাবলি। সবই অনুমান করতে হচ্ছে এখনও, অন্তত ঐতিহাসিক ভাবে

পাওয়া যাচ্ছে না। সে তাঁর জন্ম, মৃত্যু, ভ্রমণ এমনকি কার্যক্রম সম্পর্কেও। যা জানা যায় তা ওই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' হতেই সিংহভাগ। সুতরাং গ্রন্থটিকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় থাকে না। কিন্তু অন্যান্যদের এমন নীরবতার কারণ কী? অদ্বৈত আচার্যের বিরোধিতা নাকি বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর এড়িয়ে চলা? নাকি নিত্যানন্দের আচরণ আর কার্যকরণই তাঁকে তৎকালীন গোস্বামী ও বৈষ্ণব মহান্তদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল? আবার যদি তাই-ই হবে তাহলে গৌরসুন্দর নিজেই কেন নিজেকে নিত্যানন্দের অভিন্ন বলবেন, নিত্যানন্দ বিদ্বেষীদের নিজের অপ্রিয় ভাববেন, নিত্যানন্দ-স্বরূপকে ব্রহ্মারও বন্দনীয় বলবেন?

মধ্যযুগের যুগনায়ক শ্রীচৈতন্যই সঠিকভাবে চিনেছিলেন নিত্যানন্দকে। তাই তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রচারের প্রধান অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নিত্যানন্দকে। যেমন রামকৃষ্ণ নির্বাচন করেছিলেন বিবেকানন্দকে। নিত্যানন্দও এই কাজে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গৌড়বঙ্গে নেমে পড়েছিলেন। তৈরি করেছিলেন দ্বাদশ গোপাল, দ্বাদশ উপগোপাল সহ অন্যান্য বৈষ্ণব প্রচারকদের। নিয়মনীতির কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে সহজ করে দিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মকে। মুক্ত-বৈষ্ণবধর্মের উদারপন্থী প্রচারক-ই যেন নিত্যানন্দ। সেখানে কোনো জড়তা নেই। বিধির বাধানিষেধ নেই। আছে মাত্র মুক্তির আশ্রয় ও আনন্দ। নিত্য আনন্দ।

বাংলা সাহিত্যে মানব-বন্দনা শুরু হয়েছে চৈতন্য-গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করেই। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম। তার আগে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগে 'চর্যাপদ' ছিল, সেখানে ধনী-দরিদ্রের চিত্ররূপ ধরা পড়লেও গ্রন্থটি বৌদ্ধ সিদ্ধ-সাধকদের আচরণ-গাথা। তাঁরা এবং তাঁদের শিষ্য-সখারা কোন্‌টি করবেন আর কোন্‌টি করবেন না তারই নির্দেশনামা হিসেবেই এ গ্রন্থের উৎস-আখরগুলি লেখা। নশো-বারোশো-র মধ্যে চর্যাপদের পদগুলি লিখিত। আবার মধ্যযুগের শুরু তথা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লিখলেন বড়ু চণ্ডীদাস এবং তিনি যে কৃষ্ণের কথা জানালেন জনসমাজকে, তা লৌকিক-কৃষ্ণ মাত্র। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম বারো-টি অধ্যায় বা খণ্ডে কৃষ্ণের 'শ্রী' বা 'কীর্তন' কিছুই প্রকাশ পায়নি। তেরো সংখ্যক অধ্যায়ে তথা 'রাধা বিরহ' অংশেই কৃষ্ণ-বিরাগিনী রাধা, প্রথম কৃষ্ণ-অনুরাগিনী- রাধায় পরিবর্তিত হয়েছেন। তার আগে বহুবার রাধার কাছে বহুভাবে কৃষ্ণ লাঞ্ছিত হয়েছেন এ গ্রন্থে। তাই আরাধ্যকে অপমানিত হতে দেখে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বর্জন করেছিলেন চৈতন্যদেব। তুলনায় অনেকটা মোটাদাগের অশ্লীলতা থাকলেও জয়দেব গোস্বামীর 'শ্রীশ্রী গীতগোবিন্দ' তিনি শুনতেন। যিনি বিষ্ণুর সেবক-বৈষ্ণব, শ্রী বিষ্ণু-কৃষ্ণ-নারায়ণের নিন্দা শোনা তাঁর পাপ, অন্যায়ও। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভক্তের অন্যতম আশ্রয়। আশ্রয়চ্যুত-ভক্ত দিশাহীন, দিগ্‌বিদিক-শূন্য নরজঞ্জাল মাত্র।

গৌরাঙ্গের গণমুখী-ভাব প্রচার করেছেন এবং সে প্রচার ও প্রসারে নেতৃত্ব দিয়েছেন নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিত্যানন্দ বীরভূমের একচক্রা গ্রামে জন্মেছেন ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের

১২ জানুয়ারি (মাঘ মাসের শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে, বৃহস্পতিবারে), তাঁর অপ্রকটের কাল ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ। তিনি গৌরাঙ্গের সাথি-সেবক হয়েও বহুক্ষেত্রেই তাঁর চলার-পথ ঠিক করে দিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে এগিয়ে দিয়েছেন অনাথ-আতুর-অবহেলিতের দুয়ার পর্যন্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ-চৈতন্যদেব ১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের অবর্তমান কালেও নিত্যানন্দ ছিলেন এবং সে সময় বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন প্রধান। সর্বাধিনায়ক। ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে শ্রীবাসের বাড়িতে গৌরাঙ্গের অভিষেক হয় এবং তারপর তাঁকে পথভ্রষ্ট করে নিত্যানন্দই তিনদিন রাঢ় দেশ ভ্রমণ করিয়ে নেন সন্ন্যাস গ্রহণের পরপরই। কাটোয়া থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল। আবার গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসচিহ্ন দণ্ডটিকেও তিনি ভেঙে ফেলে একমুখী করে তুলেছিলেন তাঁকে। গৌরাঙ্গ শাস্ত্রসম্মতভাবে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, প্রচুর বিদ্যা অর্জন করে নবদ্বীপে আহূত পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে যুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন এবং তিনি তেমন কোনো ব্রাত্য-অনাহূতের ভিক্ষা গ্রহণ করছিলেন বলেও জানা যায় না। গৌরাঙ্গের মধ্যে দেবভাবও পরখ করেছেন ভক্ত-শিষ্য-সখারা। সে অর্থে নিত্যানন্দ সর্বার্থেই 'মানুষ'। বলা ভালো— 'দোষেগুণে মানুষ'। তাঁর একমাত্র ব্রত হল মানব কল্যাণ, পতিতোদ্ধার। আম-জনতার সমতলে বসে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত কৃষ্ণনামগানের মাধ্যমে প্রেম-বিতরণ। এই 'মানুষ-নিত্যানন্দে' আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই বঙ্গবাসী জনসাধারণ শ্রীচৈতন্যকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন। কানু ছাড়া গীত গাননি সারা মধ্যযুগে। বাংলার ব্রাত্য-বঞ্চিত-শোষিত-পতিত-বর্ণাশ্রম লাঞ্ছিত গণমানুষ বিশ্বাস করতেন— ভালোবাসতেন নিত্যানন্দকে। উনবিংশ শতকে জন্মালে নিত্যানন্দ একজন বামপন্থী নেতাই হয়তো হয়ে উঠতেন। যদিও চৈতন্যের মানবপ্রেমের ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি বামপন্থী—জননেতাই। সেখানে অদ্বৈত আচার্যকেই ডানপন্থীদের পুরোধা বিবেচনা করা যেতে পারে। সেকালেও নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে বহু শলা হয়েছে, চৈতন্যের কাছে অভিযোগও করেছেন অনেকে, অদ্বৈত আচার্যও তাঁকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তথাপি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য তা কানে করেননি, বরং বলেছেন—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য জানিহ তাহারে।।

আসলে মানবতাবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্রষ্টা চৈতন্যদেব, তার মুখ্য পরিচালক নিত্যানন্দ। সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যরা থাকলেও তাঁরা সেভাবে অন্তত বাংলাদেশে অধঃপতিত মানবকুলে বৈষ্ণবধর্মকে সহজভাবে ও আচরণে নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁরা ছিলেন শাস্ত্র নির্দেশিত পথে, আর নিত্যানন্দ সে পথকে অতিক্রম করে অনেকটাই এগিয়ে এসেছিলেন তাদেরই সমতলে। 'অবধূত' হয়ে।

কাটোয়ায় দীক্ষিত হবার পর সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছিলেন গৌরাঙ্গ। তাঁর সন্ন্যাস জীবনের সময়কাল মাত্র চব্বিশ বছর। তার মধ্যে প্রথম ছ-বছর তিনি কাটিয়েছেন

বৃন্দাবন-কাশী বারাণসী প্রভৃতি জায়গার সঙ্গে বাংলার রাঢ়বঙ্গেও। গৌড়ীয় রাঢ়বঙ্গে তিনি প্রায় দু-বছর সময়কাল অতিবাহিত করেছিলেন এবং এখানের পুরোটা সময়ই তাঁর সঙ্গে ছিলেন লোকপ্রিয় নিত্যানন্দ। যে সাম্যবাদী নিত্যানন্দ বিচলিত-সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গকে পথ দেখিয়েছেন— 'যা কর, সকলকে নিয়ে থুয়ে কর।' এই সমষ্টি চেতনার গুণেই নিত্যানন্দ জনপ্রিয়। সত্যকে প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি কখনোই কুণ্ঠিত ছিলেন না, তা সে চৈতন্যের কাছেও না। নিরপেক্ষ সমন্বয়ী মনটিকে সর্বদা গুরুত্ব দিতে গিয়েই তিনি বুঝেছিলেন আচারের কড়াকড়ি থাকলে বৈষ্ণব-ধর্মের ছত্রতলে সব মানুষের আশ্রয় হবে না। সুতরাং আরও সহজ ও সাধারণ হয়ে ওঠা প্রয়োজন। আরও মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া প্রয়োজন।

গৌরাঙ্গের বাকি আঠারো বছরের সন্ন্যাস জীবন কাটে পুরীতে এবং পুরী থেকেই চৈতন্য-নির্দেশেই গৌড়ীয় রাঢ়বঙ্গে বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিত্যানন্দ চলে আসেন বাংলায়। তাহলে বিষয়টি বেশ স্পষ্ট যে, এ বঙ্গভূমে বৈষ্ণব-ধর্মান্দোলন পুরোপুরি- ভাবেই পরিচালনা করেছেন নিত্যানন্দ— লোকনায়ক নিতাই। সেই 'অবধূত' নিত্যানন্দ পরিচালিত বৈষ্ণব-ধর্মান্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন হরিদাস সহ 'দ্বাদশ-গোপাল' এবং অন্যান্য সেবক-অনুসেবকবৃন্দ। তিনি বুঝেছিলেন এই বাংলায় প্রেমধর্ম-বৈষ্ণবধর্ম তথা মানবধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান-চেতনাসম্পন্ন মানবকুলের প্রয়োজন। তাই নির্বাচন করেছিলেন 'দ্বাদশ গোপাল' তথা বারো-জন 'নিজজন' তথা বারো-জন 'জননেতার'। এঁদের তিনি 'দেবতা' হিসেবে গড়ে তোলেননি, বরং এঁদের মাধ্যমেই গৌর-নিতাইকে তথা বৈষ্ণবের প্রেমধর্মকে পৌঁছে দিতে মানুষের তথা অনাথ-আতুর-পতিতের দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছেন। শুরু করে দিয়েছেন প্রবলভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্যের নাম-সংকীর্তন। তারই ফলে সারা মধ্যযুগ জুড়েই 'কানুবিনা গীত ছিল না'। বৈষ্ণব-ধর্মের ছাতার তলায় শুধুমাত্র নিত্যানন্দের উদ্যোগেই জাতপাত নির্বিশেষে সব মানুষ আশ্রয় পেয়েছেন। ধনী-দরিদ্ররা এক সমতলে বসেছেন। এসেছে বৈষ্ণবের পোশাক এবং পথ-সংকীর্তন। এসবের আয়োজনেও নিতাই-ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বঙ্গদেশ জুড়ে। তিনিই পথ দেখিয়ে একটি লক্ষ্যের, একটি আলোর দিকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন বাংলার অধঃপতিত-দরিদ্র-বিচলিত মানুষজনকে। চঞ্চল-দিক্‌ভ্রান্ত-অসংযমী মানুষজনকে একটি আদর্শে—একটি নীতিসম্মত পথে—একটি ভালোবাসার ভেতর আশ্রয় পেতে সাহায্য করেছিলেন জনগণতন্ত্রের তৎকালীন বাংলাদেশের একমাত্র পরিচালক নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পানিহাটির 'দণ্ড-মহোৎসবে' তিনিই আপামর জনসাধারণকে এক-পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে চিঁড়ে-ফলার খাইয়ে হিন্দু-বর্ণাশ্রমের বিভেদ-কারাগারের দরজা খুলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন দু-হাট করে। তার ফলেই বৈষ্ণব ধর্মের মাটি শক্ত হয়েছিল, ধর্মটি গৃহীত হয়েছিল জনমনে। আমজনতা বুঝতে পেরেছিলেন এই ধর্ম আশ্রয় করে বাঁচা যেতে পারে। এ ধর্ম বিদ্বেষের ধর্ম নয়, এ ধর্ম সম্মিলনের এবং

আশ্রয়ের। বৈষ্ণব ধর্মকে ঠিক এই জায়গায় নিয়ে আসতে, তাকে 'মানবধর্মে' রূপান্তরিত করতে সেকালের সমাজ-ব্যবস্থায় একজন মানুষই শুধুমাত্র মাথা উঁচু করে বাংলার পথে-প্রান্তরে-গঞ্জে-জনপদে হিমালয়ের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলেন— তিনি নিত্যানন্দ। আর কেউ-ই নন। তাই আজও 'জয় নিতাই' বলেই মানুষ আশ্রয় খোঁজে, জীবনে বেঁচে থাকার রসদ এবং প্রাণের আরাম—মনের শান্তি খুঁজে পান।

মধ্যযুগের প্রথম পর্ব পর্যন্ত যে রাধাকৃষ্ণ সমাজে প্রচলিত ছিল, তা— লোকায়ত রাধাকৃষ্ণ। সে রাধাকৃষ্ণে লক্ষ্মী-নারায়ণের ধ্রুববিষয়ে অবস্থান নেই বললেই চলে, সেখানে একেবারে লৌকিক প্রথায় নষ্ট-চরিত্রের দুই নারীপুরুষকে হাজির করা হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই সে রাধাকৃষ্ণকে বা তাকে কেন্দ্র করে লেখা বইপত্রকে শ্রীচৈতন্য বর্জন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আপামর জনসাধারণের কাছে এই রাধাকৃষ্ণকে হাজির করলে তাতে সমাজের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই হবে বেশি। এই রাধাকৃষ্ণে 'শ্রী' বা 'কীর্তন' যেটুকু আছে তা গ্রহণের আগেই জনগণ বিপথগামী হয়ে পড়বে। অতখানি ধৈর্য সাধারণ জনগণের নেই। তাই লোকায়ত ক্ষেত্রটিতে গৌড়ীয়-মুখোশ চাপিয়ে বৈষ্ণবধর্মকে অনেক মানবিক এবং রাধাকৃষ্ণের ওপর ভক্ত-ভগবানের দেবত্ব আরোপিত হল চৈতন্যকে কেন্দ্র করেই। এই ধ্রুপদি রাধা হলেন ভক্তের প্রতীক এবং কৃষ্ণ হয়ে উঠলেন কৃপাদানের উৎস শ্রীকৃষ্ণ এবং এই শ্রীকৃষ্ণকে মিলিয়ে নেওয়া হল শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণের সঙ্গে। কিছু নিয়মকানুনও প্রবর্তিত হল, এল আচার-বিচার সহ নিষ্ঠা-ভক্তি-আনুগত্য। সবমিলিয়ে বৈষ্ণব-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হল, রচিত হল তার নিয়মকানুনও! এই নিয়মকানুন বাংলার বৈষ্ণবসমাজে কঠোরভাবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বৃন্দাবনের 'ষড়গোস্বামী'। অদ্বৈত আচার্যও ছিলেন তাঁদেরই পথের-পথিক। শ্রীকৃষ্ণের সেবক শ্রীবিষ্ণুর উপাসক হয়েও নিত্যানন্দ নিয়মের কঠোরতা এবং আচার-সর্বস্বতাকে গ্রহণ করেননি। তাই সেকালের বৈষ্ণব গোস্বামীরা নিত্যানন্দকে গ্রহণ করেননি অন্তর থেকে। শুধুমাত্র চৈতন্যের কারণে তাঁরা তাঁকে বর্জন করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু সুযোগ পেলেই তাঁর বিরুদ্ধে 'আনকথা' বলেছেন। এও বুঝিয়েছেন যে, নিত্যানন্দ-ই নাকি বৈষ্ণব-সমাজের সর্বনাশ করছেন। এসবকথা আকথা-কুকথা অবশ্য নিত্যানন্দ-অবধূতকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি তাঁর নিজস্ব মতে-পথে-আরাধনায় অন্তত বাংলার মানুষজনকে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যচর্চা এবং সেবায় নিয়োজিত রাখতে আপনার মতো সমর্থ হয়েছিলেন। যার গতিধারা প্রবাহিত হয়েছিল সারা ভারতবর্ষে-অসমে এবং ভারতের বাইরেও। নিত্যানন্দই সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের অন্যতম ব্যক্তিত্ব যিনি বুঝেছিলেন— বৈষ্ণবধর্মকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবাকে, মানবমুখী না করতে পারলে, তাকে সমগ্র মানবসমাজে জাতিনির্বিশেষে নিয়ে যেতে না পারলে, তাকে বাঁচানো যাবে না। মানুষের আশ্রয় আর আধার হয়ে উঠতে হবে বৈষ্ণবধর্মকে। আর সেটা করতে হলে নিয়মনিষ্ঠাকে সহজ করতে হবে, ধর্মকে জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য, তিনি তাই-ই করে দেখিয়েছেন।